দ্যা নিউ ওয়ার্ল্ড

দ্যা নিউ ওয়ার্ল্ড

মোশতাক আহমেদ

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : জয় কর্মকার

রচনাকাল : ১৫.১০.২০২০–২৪.০১.২০২১

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

The New World by **Mostaque Ahamed**
Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021

Price : 400.00
US $ 15

ISBN 978 984 94901 7 3

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
www.booklightbd.com ফোনে অর্ডার করতে ০১৪০০৪০০৪০০
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

বাংলাদেশ
প্রিয় মাতৃভূমি

লেখকের কথা

যদি পারতাম
এই উপন্যাসটি দিয়ে
একটি চলচ্চিত্র বানাতাম

ডক্টর হাইবিন তার টেবিলের ওপর ছোট্ট হাতির মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে আছেন। হাতিটি দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। কীভাবে যেন কাত হয়ে পড়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করেও বের করতে পারলেন না কারণটা। শেষে হাত দিয়ে আবার দাঁড় করিয়ে দিলেন দুই ইঞ্চি উচ্চতার মূর্তিটা। অতঃপর মনোনিবেশ করলেন কম্পিউটার স্ক্রিনে।

কালচে একটা বিন্দু দেখা যাচ্ছে মহাশূন্যে। গতি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। ডক্টর হাইবিন লেন্স জুম করে বিন্দুটিকে ভালোমতো দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিন্দুটিকে খুব একটা বড়ো করতে পারলেন না। শেষে পাশের সুপার কম্পিউটারে গিয়ে বসলেন। এই কম্পিউটারের ক্ষমতা সাধারণ কম্পিউটারের থেকে কয়েকশত গুণ বেশি, খরচ বেশি হওয়ায় প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করেন না তিনি। সুপার কম্পিউটারে রোবটিক মোডিউল থাকায় মানুষের সাথে কথা বলতে পারে। ফলে তুলনামূলকভাবে কাজ করা সহজ হয়।

ছোটো বিন্দুটিকে সুপার কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন আন্তঃমহাজাগতিক গবেষণাকেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডক্টর হাইবিন। কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারলেন, বিন্দুটি সাধারণ কোনো বিন্দু নয়। একটি ধূমকেতু। ধূমকেতুর সামনের অংশ দেখতে পেলেও পেছনের অংশ দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। তাই প্রশ্ন করলেন, পেছনের অংশ দেখা যাচ্ছে না কেন?

সুপার কম্পিউটারে বিশ্লেষণধর্মী প্রোগ্রামের নাম সিসি। নারীকণ্ঠে সে জানাল, আমাদের টেলিস্কোপ শেষ অংশের ভিডিয়ো এখনো ধারণ করতে পারেনি।

কী বলছ তুমি!

হ্যাঁ ডক্টর হাইবিন। এত বড়ো ধূমকেতু আগে মহাবিশ্বে দেখা যায়নি।

কত বড়ো হবে!

অনুমান করা সম্ভব হচ্ছে না।

গতি কেমন?

সেকেন্ডে ২০ কিলোমিটার, মিনিটে ১২০০ কিলোমিটার আর ঘণ্টায় ৭২,০০০ কিলোমিটার।

তার মানে গতি অনেক বেশি। পৃথিবীর দিকেই কি আসছে ধূমকেতুটা?

না। তবে...

তবে কী?

ধূমকেতুটি সম্ভবত আমাদের সৌরজগতের নয়। অন্য কোনো সৌরজগৎ থেকে এসেছে। পার হয়ে যাবে সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানের মহাজাগতিক ফাঁকা জায়গা দিয়ে। গন্তব্য জানা নেই।

তুমি নিশ্চিত ধূমকেতুটি আমরা প্রথম দেখছি এবং কোনো নাম নেই ঐ ধূমকেতুর?

সিসি দুই সেকেন্ড সময় নিল। তারপর বলল, আমি শতভাগ নিশ্চিত ডক্টর হাইবিন। শুধু তাই নয়, যেহেতু আপনি প্রথম দেখেছেন এই ধূমকেতুটিকে, আপনার নামে প্যাটেন্টের জন্য আবেদনও করে ফেলেছি। আজ থেকে আপনার নামে একটি ধূমকেতুর নামকরণ করা হলো। আপনি সত্যি সৌভাগ্যবান।

ডক্টর হাইবিন খানিকটা উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, তোমার কথা শুনে ভালো লাগছে সিসি।

ধন্যবাদ প্রফেসর। তবে একটা দুঃসংবাদ আছে।

কী দুঃসংবাদ!

ধূমকেতুটির ঘনত্ব অনেক বেশি। এত বেশি যে ধূমকেতুর মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে পারবে না। এজন্য ধূমকেতুটি যখন পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার মহাজাগতিক পথ অতিক্রম করবে তখন সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাবে না।

কতক্ষণের জন্য?

দিন ক্ষণে হিসাব করা যৌক্তিক হবে না, মাসে হিসাব করতে হবে। যেহেতু এখনো আমার সিস্টেম ধূমকেতুর সঠিক দৈর্ঘ্য এবং গতি নির্ণয় করতে পারেনি আমি আপনাকে শতভাগ নির্ভুল ফলাফল দিতে পারব না। তবে গাণিতিক বিশ্লেষণ অনুসারে সময় তিন মাসের কম হবে না।

কী বলছ!

হ্যাঁ প্রফেসর। পৃথিবী এই তিন মাসের জন্য ডুবে যাবে নিকষকালো অন্ধকারে।

তিন মাস পৃথিবীতে সূর্যের আলো না এলে কী ভয়ংকর অবস্থা হবে, বুঝতে

পারছ? সূর্যের আলো না থাকলে পৃথিবীতে দিনরাত হবে না, উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে, আমরা শ্বাস নেওয়ার জন্য কোনো অক্সিজেন পাব না, গাছ খাদ্য তৈরি করতে পারবে না, আমরাও পারব না খাদ্য সংগ্রহ করতে। সেক্ষেত্রে তো আমরা মারা যাব।

আমার বিশ্লেষণ সেরকমই বলছে।

কী সাংঘাতিক! তাহলে কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মানবজাতি!

নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, কারণ হুবহু এরকম ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। এই প্রথম।

কী ভয়ংকর! কতদিন লাগবে এই ধূমকেতুর সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে পৌঁছাতে?

যে গতিতে আসছে তাতে মাত্র এক মাস সময় পাওয়া যাবে প্রস্তুতির জন্য।

আমরা কি কোনোভাবে গতি পরিবর্তন করে দিতে পারব?

না, সম্ভব না। কারণ ধূমকেতুটি অনেক বড়ো। আগেই জানিয়েছি, এত বড়ো ধূমকেতু পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। আমার সার্বিক বিশ্লেষণ বলছে, পৃথিবীতে মহাবিপর্যয় নেমে আসবে এই হাইবিন ধূমকেতুর জন্য।

ডক্টর হাইবিন অস্থির হয়ে বললেন, এই ভয়ংকর ধূমকেতুটির নাম আমি আমার নামে রাখতে চাই না।

আর সম্ভব নয়, প্যাটেন্টের প্রাথমিক অনুমোদন আমরা পেয়ে গেছি। কাজেই চাইলেও আর নাম পরিবর্তন সম্ভব হবে না।

প্রফেসর হাইবিনের হাত-পা কাঁপতে শুরু করল। তিনি ঘড়ি দেখলেন। আন্তঃমহাজাগতিক গবেষণাকেন্দ্রের প্রধান এখন অফিসেই আছেন। তাকে বিষয়টা জানাতে হবে। তাই আর দেরি করলেন না। এখন পর্যন্ত পাওয়া প্রতিবেদনগুলো প্রিন্ট করে ছুটলেন আন্তঃমহাজাগতিক গবেষণাকেন্দ্রের প্রধানের উদ্দেশে।

ইফান আর রিফান পাহাড়ের ওপর উঠছে। আগে কখনো রিফান পাহাড়ের এত ওপরে ওঠেনি। তারই অনুরোধে তার বড়ো ভাই ইফান আজ পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছে। লক্ষ্য একেবারে চূড়ায় পৌঁছানো। চূড়া আর বেশি দূরে নেই। তবে রিফানের এখন বেশ ভয় করছে। নিচে তাকালে পা শিরশির করছে। অনেক ওপরে উঠেছে তারা। পাহাড়টা যে এত উঁচু নিচ থেকে বোঝা যায় না। হাত-পা কেমন যেন কাঁপতে শুরু করেছে এখন। শেষে আর থাকতে না পেরে বলল, ভাইয়া আমার ভয় করছে।

ইফান মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কিছুটা ভয় লাগবে। তবে ঘনঘন উঠলে ভয় থাকবে না। ধরো আমার হাত ধরো।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিই।

ঠিক আছে। তাহলে পাশের ঐ বড়ো পাথরটাতে হেলান দাও। ভালো লাগবে।

পাথরে হেলান দিয়ে রিফান সামনে বিলের দিকে তাকাল। বিশাল বিল। ঐ মাথায় কী আছে দেখা যায় না। শুধু চিকন সবুজের একটা টান চোখে পড়ে। রিফান বলল, ভাইয়া নিতল বিলের ঐপাশে কী আছে?

আমি কখনো যাইনি। তবে গ্রাম রয়েছে।

বিলের পানি অনেক বেশি, তাই না?

হ্যাঁ অনেক বেশি।

একদিন নৌকায় করে আমরা ওপাশে যাব।

তুমি তো এই পাশে অনেকবার ঘুরেছ। ওপাশে গিয়ে কী করবে?

দেখব কী আছে।

আচ্ছা ঠিক আছে। এখন ওঠো, ওপরে যাই। আকাশে মেঘ আছে। যে-কোনো সময় বৃষ্টি হতে পারে। ওপরে উঠে আবার নামতে হবে আমাদের।

শেষ গুহাটা কত ওপরে?

ঐ তো দেখা যাচ্ছে।

আবার ওপরে উঠতে শুরু করল ইফান। এবার সে সামনে দিয়েছে রিফানকে, এতে ঝুঁকি কমবে রিফানের। পথটা খুব একটা খাড়া না। তবে অমসৃণ। অনভ্যস্ততার কারণে বেশি ভয় পাচ্ছে রিফান। গড়িয়ে একেবারে নিচে পড়ার উপায় নেই। বেশ গাছপালা আছে চারপাশে। কিছু কিছু গাছ অনেক বড়ো আর মোটা। আর আছে অনেক লেবুগাছের ঝোপ। তারপরও ভয় করছে রিফানের। ভয় পাওয়ার কারণও আছে। রিফানের জন্ম হয়েছে রাজশাহীতে, শৈশব ওখানে কাটিয়ে বড়ো হয়েছে ঢাকায়। এখন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র সে। গ্রামে আস্‌লেও পাহাড়ে উঠেছে কম। জীবনে আজই এত ওপরে উঠেছে সে। তাও ইফান নিয়ে এসেছে বলে। কীভাবে যেন রিফান শুনেছে যে পাহাড়ের ওপর অনেক বড়ো একটা গুহা আছে। সেই গুহাটাই দেখার জন্য উঠেছে। পাশাপাশি আরেকটা উদ্দেশ্য আছে, চূড়ায় ওঠা। ইফানের জন্য ব্যাপারটা কঠিন না কারণ সে অনেকবার পাহাড়ে উঠেছে। শৈশব আর কৈশোরের উল্লেখযোগ্য অংশ কাটিয়েছে এখানে তার দাদাবাড়িতে। এজন্য আশেপাশের পাহাড়গুলো সব তার চেনা। তবে শৈশব আর কৈশোরের বন্ধুরা এখন আর নেই। তার বাবা নাজমুল আহমেদ তাকে আর তার মাকে কর্মস্থলে নিয়ে গেলে বন্ধুদের সাথে বিচ্ছেদ ঘটে তার। তবে নিয়মিত গ্রামে আসত। কিন্তু কেন যেন বন্ধুদের সাথে আগের সেই সম্পর্কটা আর টিকে থাকেনি। তার বাবার চাকরির সুবাদে বিভিন্ন শহরে নতুন বন্ধুও হয়েছে, সময়ের পরিক্রমায় তারাও হারিয়ে গেছে। শুধু স্কুলকলেজের কয়েকজন বন্ধুর সাথে যোগাযোগ আছে এখনো।

ইফান বুয়েট থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙে স্নাতক শেষ করেছে। একটা চাকরিও পেয়েছে। যোগ দেবে আগামী মাসে। এখন ময়মনসিংহ শহরে পরিবারের সবাই একসাথে থাকে। তার বাবা বাংলাদেশ বেতারের ময়মনসিংহ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার। এই কারণে সরকারি কোয়ার্টারও পেয়েছে ময়মনসিংহতে। রিফান ভর্তি হয়েছে ময়মনসিংহের জেলা স্কুলে। রিফানের সাথে তার বয়সের পার্থক্য প্রায় তেরো বছর। রিফান খুব ভক্ত তার। স্কুল বন্ধ থাকায় রিফানকে নিয়ে এসেছে গ্রামে তাদের দাদাবাড়িতে। তার দাদা হায়দার আহমেদ অত্যন্ত কর্মঠ ব্যক্তি। গ্রামে অনেক জমিজমা আছে তার। নিতল বিলে তিনশো বিঘার ওপরে জমি আছে। আর বাড়িসংলগ্ন একশো একর পাহাড়ি জমি সরকারের কাছ থেকে চল্লিশ বছর আগে লিজ নিয়েছেন। এই জমিতে লেবু, কাঠ আর ফলগাছের চাষ করেন তিনি। এজন্য গ্রামের বাড়িতে আস্‌লে আর যেতে ইচ্ছে করে না ইফানের। ইফানের দাদি অবশ্য বেঁচে নেই। তিন বছর আগে বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেছেন। গ্রামের বাড়িতে তার দাদা একাই থাকেন,

সাথে থাকে সতেরো বছরের রশিদ। সে-ই মূলত দেখাশোনা করে তার দাদার। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সব কাজে পটু সে। জমিজমা দেখার জন্য আলাদা লোক আছে। তবে তাদের সংখ্যা এখন কম। কারণ বয়স হয়ে যাওয়ায় আর আগের মতো জমিজমার প্রতি মনোযোগী হতে পারেন না তার দাদা। এজন্য বাড়ির জমজমাট ভাবটা অনেকটাই কমে এসেছে। তবে এই বাড়ির প্রাণ তার দাদু হায়দার আহমেদই। বয়স হলেও তিনি হেঁটে হেঁটে বাড়ি আর আশেপাশের প্রত্যেকটা বিষয় নজরে রাখেন।

অবশেষে গুহায় এসে পৌঁছাল ইফান। রিফান গুহাটা দেখে বলল, কী সুন্দর! আর কত বড়ো। কয়েকটা বড়ো বড়ো পাথরও আছে দেখছি। কীভাবে তৈরি হয়েছিল এই গুহা, ভাইয়া? আর এই পাথর, কত বড়ো! একটা পাথর বাড়িতে নেওয়া যাবে?

আমি জানি না। অনেক আগে প্রাকৃতিকভাবে হয়েছে। এই পাহাড়গুলোতে ছোটোবড়ো অনেক গুহা আছে। গুহাগুলোর নিচে পাথর। তবে পাথরগুলো শক্তভাবে বসানো না, বিশেষ করে নিচের দিকের গুলো। দুই পাথরের মাঝে মাটির স্তর রয়েছে। এজন্য খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাথর তুলে ফেলা সম্ভব। অবশ্য এখান থেকে পাথর উত্তোলন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

ও আচ্ছা। কী দারুণ বাতাস!

হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। মন জুড়িয়ে যায়।

আর পানির দিকে দ্যাখো। কী অপূর্ব!

শাপলা ফুলের জন্য সুন্দর লাগছে বিলটাকে।

নৌকায় চড়ব কবে?

বিকেলে তোমাকে নৌকায় উঠাব। তারপর ঘুরব দুজনে।

তুমি নৌকা বাইতে পারো।

হ্যাঁ পারি। আমাদের তো নৌকা আছে। সমস্যা হবে না। আর রশিদ তো আছে। তিনজনে বিলের অনেক ভেতরে চলে যাব, তারপর শাপলা নিয়ে আসব।

দারুণ হবে। আমার অবশ্য ভয় নেই।

ভয় থাকবে কেন? তোমাকে তো সুইমিংপুলে সাঁতার শেখানো হয়েছে। পারবে না ঐ পানিতে সাঁতরাতে।

ইতস্তত ভঙ্গিতে রিফান বলল, মনে আছে কি না বলতে পারব না।

মানুষ একবার সাঁতার শিখলে আর ভোলে না। যাই হোক, এখন চলো চূড়ায় উঠি। ওখান থেকে চারপাশটা দেখা যাবে।

পাহাড়ের চূড়া থেকে চারদিকে তাকালে মন জুড়িয়ে যায়। রিফান তো অবাক!

এতদিন সে তার দাদাবাড়ির সবকিছু নিচ থেকে দেখেছে। আর আজ দেখছে ওপর দেখে। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। আর একদিকে পানি। সবুজে ভরা এত সুন্দর দৃশ্য সে আগে দেখেনি। নিজের অজান্তেই বলে উঠল, অপূর্ব ভাইয়া, অপূর্ব।

সত্যি অপূর্ব। এখন চলো নিচে যাই, দাদা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

রিফান মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ চলো।

পাহাড় থেকে নিচে আসার সময় দুটো জাম্বুরা পাড়ল ইফান। অনেক জাম্বুরা গাছ লাগিয়েছে তারা দাদা। কয়েকটি গাছে সারাবছরই জাম্বুরা হয়। জাম্বুরার বড়ো একটা বাগানও আছে তাদের। আছে বিশাল তিনটি পুকুর। মাছ চাষ করা হয় ওগুলোতে। আগে অনেক গবাদিপশু ছিল। ছিল গরু আর ছাগলের খামার। এখন শুধু দুটো গরু আছে, সাথে দুটো বাছুর। আর আছে একটা ছাগলের খামার। ঐ খামারে বিশটির মতো ছাগল আছে, বিক্রির প্রক্রিয়া চলছে। ছাগলের খামারের পাশে তিন একর নিয়ে সবজির বাগান। লাউ, কুমড়া, ঝিঙা এ জাতীয় সবজিই বেশি। এই বাগান দেখার জন্য আলাদা লোকজন আছে। সবকিছু মিলিয়ে বিশাল এক খামারবাড়ি বলা চলে বাড়িটাকে। কেউ একবার আস্‌লে আর সহজে যেতে চাইবে না। একই অবস্থা ইফান আর রিফানের। এখানে আসার পর আনন্দময় নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারা। কীভাবে যে সময় কাটে টের পায় না। তারপর হঠাৎই যে চলে যাওয়ার দিন আসে। তখন খুব মন খারাপ হয়ে যায়। এখন অবশ্য একটা সুবিধা আছে। তাদের বাবা বদলি হয়ে ময়মনসিংহ এসেছে। এখান থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরের পথ। এজন্য দিনে এসে আবার দিনে চলে যাওয়া যায়। তারপরও আসা হয় না নিয়মিত।

মূল বাড়িটা একতলা। চল্লিশ বছরের পুরাতন বাড়ি। দেখতে খুব সুন্দর। ভেতরে বড়ো বড়ো অনেকগুলো কক্ষ। বাড়ির সামনে বিশাল বারান্দা। ছাদটাও সুন্দর। ছাদে বসে খোলা আকাশ দেখতে দারুণ লাগে। ইফানরা এখানে এলে সন্ধ্যার পর ছাদে ওঠে, থাকে তাদের দাদা হায়দার আহমেদও। সবাই মিলে গল্প করে অনেক রাত পর্যন্ত।

হায়দার আহমেদ ড্রয়িংরুমে বসে টিভি দেখছিলেন। ইফান আর রিফান ভেতরে প্রবেশ করলেও তিনি তাকালেন না। দৃষ্টি সংবাদের দিকে। হায়দার আহমেদের আচরণে অবাকই হলো ইফান। বলল, দাদা, কী দেখছ এত মনোযোগ দিয়ে?

হায়দার আহমেদ বিড়বিড় করে বললেন, সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

কী দাদা?

আয় কাছে আয়।

রিফান গিয়ে হায়দার আহমেদের কোলে বসলে হায়দার আহমেদ টিভির দিকে ইঙ্গিত করলেন। একজন সংবাদপাঠিকা আতঙ্কিত কণ্ঠে পড়ে চলছে :

> "পৃথিবীর সামনে এখন মহাবিপর্যয়। আন্তঃমহাজাগতিক গবেষণাকেন্দ্র নিশ্চিত করেছে যে পৃথিবী প্রায় তিন মাসের জন্য ডুবে যাবে অন্ধকারে। হাইবিন-নামক ধূমকেতুর গতিপথ পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যবর্তী মহাকাশ এলাকায় হওয়ায় সূর্যের আলো তিন মাসের জন্য পৃথিবীতে পৌঁছাবে না। বিষয়টি তিনদিন আগে আন্তঃমহাজাগতিক গবেষণাকেন্দ্র জানতে পারলেও আজ তারা প্রকাশ করেছে। কারণ গবেষণাকেন্দ্র নিশ্চিত হতে চেয়েছিল যে সম্পূর্ণ বিষয়টি সত্য। হাতে সময় রয়েছে আর মাত্র চার সপ্তাহ। এই চার সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে অন্ধকারে বেঁচে থাকার প্রস্তুতি নিতে হবে। কী ঘটবে সবকিছু এখন অনুমান করা মুশকিল? কারণ মানুষ আগে কখনো একরম ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলছে, তিন মাস পৃথিবীতে সূর্যের আলো না পৌঁছালে পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে থাকবে, দিনরাতের পার্থক্য বোঝা যাবে না। সালোকসংশ্লেষণ না হওয়ায় উদ্ভিদ তার খাদ্য তৈরি করতে পারবে না এবং অক্সিজেন উৎপাদন হবে না। ফলে গাছপালা সব মারা যাবে। প্রাণীরাও বেঁচে থাকতে পারবে না। কারণ বাতাসে অক্সিজেন থাকবে না। ধীরে ধীরে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাওয়ার কারণে পৃথিবী মানুষ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। ফলে মানবসভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তবে পৃথিবী থেকে প্রাণের চিহ্ন একেবারে উবে যাবে না। গভীর সমুদ্রের তলদেশে কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ বেঁচে থাকবে যাদের খুব একটা আলোর প্রয়োজন হয় না। অবশ্য অন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ বেঁচে থেকে লাভ কী যদি মানুষই বেঁচে না থাকে। যাই হোক, আন্তঃমহাজাগতিক গবেষণাকেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রত্যেক দেশের সরকারপ্রধানদের অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন তাদের নাগরিক-সহ সকল প্রাণী ও উদ্ভিদকুলকে বাঁচিয়ে রাখার কার্যক্রম শুরু করে। কারণ সংকটময় এই মুহূর্তে একটি দেশের অন্য একটি দেশের সহায়তায় এগিয়ে আসার সম্ভাবনা একেবারেই কম। প্রত্যেক দেশের নাগরিকদের ঐ দেশের সরকারকেই রক্ষা করতে হবে। আমাদের কাছে প্রাথমিক তথ্য এতটুকুই ছিল। নতুন কোনো তথ্য এলে সাথে সাথে জানানো হবে।"

সংবাদ শুনে রিফান অবাক হয়ে তার দাদা হায়দার আহমেদের দিকে তাকাল। তারপর বলল, কী হতে যাচ্ছে দাদা?

হায়দার আহমেদ একটু সময় নিলেন। তারপর রিফানকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, 'পৃথিবী আর মানবসভ্যতাকে টিকে থাকার জন্য এক কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে দাদাভাই।'

আমরা কি বেঁচে থাকব?

রিফানকে বুকের আরো ভেতরে টেনে নিয়ে হায়দার আহমেদ বললেন, অবশ্যই, আমি বেঁচে থাকতে তোকে মরতে দেবো না। তুই, আমি, আমরা সবাই বেঁচে থাকব, সবাই।

কথাগুলো পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল ইফান। তার কেন যেন মনে হতে লাগল, ‘তিন মাসের অন্ধকার ঐ জীবন খুব একটা সহজ হবে না পৃথিবীর মানুষের জন্য। পৃথিবী টিকে গেলেও হয়তো বাঁচতে পারবে না সব মানুষ।’

হোটেল গ্যালাক্সির আঠারো তলায় জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইনিশা। চোখ আকাশের দিকে। তার মা সুরাইয়া বেগম শুয়ে আছেন বিছানায়। বললেন, কী দেখছিস ইনিশা?

রাস্তা দেখছিলাম মা, কত মানুষ!

আসলেই এই ঢাকায় অনেক মানুষ। মানুষের শহর ঢাকা। মনটা বড়ো খারাপ হয়ে যাচ্ছে রে!

কেন?

ঢাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ইনিশা এসে তার মায়ের পাশে বসল। তারপর টেনে টেনে বলল, মন খারাপ কোরো না মা, আবার আমরা আসব।

আর কবে আসব জানি না। এবারই তো আসলাম পনেরো বছর পর। তাও এসেছি তোর বাবার শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে। বড়ো শখ ছিল বাংলার মাটিতে তার কবর হবে। শেষ পর্যন্ত পেরেছি এটাই সান্ত্বনা। তবে আমার মন টানছে না রে। মনে হচ্ছে থেকে যাই। তোর বাবার কবরের পাশে থেকে যাই।

এভাবে ভেবো না মা। কষ্ট শুধু বাড়বে।

আমি তো কষ্টেই আছি রে ইনিশা। দেশ আমার বাংলাদেশ, অথচ থাকি আমেরিকায়। আমেরিকান নাগরিকত্ব থাকা সত্ত্বেও আমেরিকাকে আমার নিজের দেশ মনে হয় না। সত্যটা কী জানিস, ‘পাসপোর্ট পালটালেও দেশ পালটানো যায় না। জন্মভূমি জন্মভূমিই’। যাই হোক, প্লেনের টিকিট কনফার্ম করেছিস?

না করিনি। এখন ট্রাভেল এজেন্সিতে গিয়ে করব।

একা একা যেতে পারবি? ঢাকা শহর তো তোর পরিচিত না। তোর জন্ম আমেরিকায়, বড়ো হয়েছিসও সেখানে। জন্মের পর গত বাইশ বছরে মাত্র একবার এসেছিস বাংলাদেশে। তাও পনেরো বছর আগে। তখন আর কতই বা তোর বয়স ছিল। সাত বছর বোধহয়। তোর কি কিছু মনে আছে?

আছে মা, অল্প কিছু হলেও আছে। নৌকায় চড়ার একটা দৃশ্য এখনো চোখে

ভাসে। তুমি আর বাবা ছিলে, তুমি হাসছিলে, খুব হাসছিলে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস। এ দেশের মাটিতে কত সুখ, কত আনন্দ! নিউইয়র্ক, আমেরিকায় নিজেকে বন্দি মনে হয় আমার। ভালো লাগে না, ওখানে আসলেই ভালো লাগে না। আমি যদি মারা যাই, তাহলে তুই আমাকে এই দেশে এনে তোর বাবার পাশে মাটি দিবি।

ইনিশা সুরাইয়া বেগমের মুখের সাথে মুখ মিশিয়ে বলল, মা তুমি এসব কথা মুখে এনো না। আমি যাই, ট্রাভেল এজেন্সিতে টিকিটটা বুকিং দিয়ে আসি।

কবে যাবি আমেরিকায়?

পারলে আগামীকালই যাব। অহেতুক দেরি করে লাভ নেই।

সম্ভব হলে পরশুদিনের টিকিট কনফার্ম করিস। আমি আরেকটা দিন এই দেশে থেকে যেতে চাই। কেন যেন মনে হচ্ছে, এখানে আমার আর ফিরে আসা হবে না।

আচ্ছা মা, পরশুদিনের টিকিটই কাটব।

আর ঐ যে হাইবিনের খবর কী? তিন মাস কি সত্যি আমরা অন্ধকারে ডুবে যাব?

বিজ্ঞানীরা সেরকমই বলছে। তবে আমার বিশ্বাস দ্বিতীয় অন্য কোনো উপায় বের করে ফেলবে বিজ্ঞানীরা। পারমাণবিক বোমার মাধ্যমে ধূমকেতুটাকে নিশ্চিহ্ন করা যায় কি না এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেছে তারা। আশা করছি ভালো কিছু শুনতে পাব। আর যাই হোক, পৃথিবী এত তাড়াতাড়ি ধ্বংস হবে না।

তারপরও একটা প্রস্তুতি আমাদের রাখা দরকার। নানারকম উপদেশ দিচ্ছে টিভিতে দেখলাম।

নিউইয়র্কে পৌঁছে সবই করব মা। তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। আমাদের বাসায় যা কিছু আছে সেগুলো ব্যবহার করে তিন মাস আমরা বেঁচে থাকতে পারব। এখন মূল চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে আমেরিকা পৌঁছানো। টিকিট পেয়ে গেলে আর চিন্তা নেই। আর তোমার শরীর ভালো থাকলে হয়। শ্বাসকষ্ট খানিকটা বেড়েছে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, অ্যাজমা বড়ো ভয়ংকর রোগ। পারলে আমার জন্য একটা ইনহেলার নিয়ে আসিস। অতিরিক্ত একটা আছে আমার কাছে। তারপরও সতর্কতার জন্য কিনছি।

ঠিক আছে মা। তুমি তাহলে টিভি দেখে সময় কাটাও, আমি আসছি।

ইনিশা রুম থেকে বের হয়ে এলো। নিউইয়র্কে যাওয়ার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। কারণ সে তার মাকে নিয়ে খুব চিন্তিত। তার মায়ের অ্যাজমা মাঝে মাঝে মারাত্মক আকার ধারণ করে। তখন জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। সে নিজে ডাক্তার হওয়ায় জরুরি সেবাটা দিতে পারছে তার মাকে। তা না হলে

হাসপাতালে ভর্তি করতে হতো। ইদানীং সমস্যাটা বেড়েছে। এজন্য অনেকটাই শঙ্কিত সে। যেভাবেই হোক দ্রুত ফিরে যেতে হবে নিউইয়র্কে। তার ওপর নতুন আতঙ্ক হাইবিন ধূমকেতু। সে নিশ্চিত, আমেরিকায় সে সুরক্ষিত থাকবে। সরকার সেখানে ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন আশ্রয়স্থল বানানো শুরু করেছে। বাংলাদেশও কাজ শুরু করেছে, কিন্তু গতি খুব ধীর। তার নিজের আমেরিকান পাসপোর্ট হওয়ায় তেমন কোনো সুবিধা সে বাংলাদেশে পাবে না। তবে তার দ্বৈত নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট আছে। এটাই যা ভরসা।